কাজী জহিরুল ইসলাম জন্মগ্রহন করেছেন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায়। তিনি আশির দশকের কবি। দেশের প্রায় সব পত্র পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী এবং প্রবন্ধ লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৯। কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'কবি জসীম উদ্দীন পুরস্কার ১৪০৬' এ ভূষিত। বর্তমানে জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা হিসাবে আইভরি কোস্টে কর্মরত। আন্তর্জালের একজন নিয়মিত লেখক। *'কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা ও তারুণ্যের প্রতি পক্ষপাত'* শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন কবি আল মাহমুদ, যেটি আল মাহমুদের প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবির সৃজন-বেদন'-এ সংকলিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, 'ক্রোধ আছে-কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসা-স্বপ্ন-তৃষ্ণা প্রবলতর অর্থাৎ জিজীবিষা আর ইতিবাচকতা। কাজী জহিরুল ইসলাম শেষ পর্যন্ত সপ্রেম দৃষ্টিতেই তাকিয়েছেন জীবন ও পৃথিবীর দিকে, ভালোবাসাতেই সিক্ত করেছেন মরুভূমির আতপ্ত হৃদয়'। সেই ভালোবাসার আলোয় স্নাত উপন্যাস 'গ্রহান্তরের সুখ' সাতরঙের পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

-সম্পাদক, সাতরঙ

গ্র হা ন্ত রে র সু খ

কা জী জ হি রু ল ই স লা ম

।। দুই ।।

কলাভবনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে যখন শেফুর সাথে ধাক্কা লেগেছিলো তখনি ওর জীবনে একটা কিছু ঘটে যেতে পারতো। কিন্তু তা ঘটেনি। ঘটেনি এজন্য যে ও মেয়েদের ঘৃণা করে এবং মেয়েদের কাছে ঘেঁষতে লজ্জা পায়। অমন লজ্জায় মরে যাবার মতো কি কিছু ঘটেছিলো? একটা ইডিয়েট। শেফুটা কতো ঘুরঘুর করলো। শেফুর ঘাড়ের ওপর ও কেবল মুনার মুখটাই দেখতে পেয়েছিলো, কালো নেকাবে ঢাকা। সেই নেকাবের আঁড়ালে লুকানো ভালোবাসার আলো ও কোনদিন খুঁজতে যায়নি। আজ মনে হচ্ছে প্রেম প্রেম একটা ভাবও যদি কারো সাথে হতো তাহলেও অন্তত প্রেমের সংজ্ঞাটা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখা হতো। মুদ্রার নোংরা পিঠটাতে থু থু মেরেই প্রায় সারাটা জীবন পার করেছে। ঘৃণার উল্টো পিঠে যে নির্মল, পবিত্র প্রেম সোহাগী চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ স্পর্শে হৃদয়-মনকে আলোকিত করে তা ওর কোনদিনই জানা হলো না। আজ জীবনের সাতাশটি বসন্তের ঝরাপাতা হঠাৎ দমকা বাতাশে উড়ে এসে ওর নিজের মুখেই ঝামটা দিচ্ছে। আর হৃদয়ের ওপর বিছিয়ে থাকা ঝরাপাতার স্তুপ সরে গিয়ে হঠাৎই যেন বেরিয়ে পড়েছে এক অমূল্য রত্ন। আজ এতো বছর পর এ কোন আলোর সন্ধান পেল ও? শত চেষ্টায়ও এ আলো ঢাকবার কোনো জো নেই। এই অলৌকিক আলোর স্পর্শে ওর

মন থেকে কষ্ট, গ্লানি, ঘৃণার সমস্ত অশুভ অন্ধকার যেন এক ফুৎকারেই পালিয়ে বেঁচেছে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদের নামই বুঝি প্রেম। এর চেয়ে মূল্যবান, এর চেয়ে দামী আর কিছু নেই, কিছু হতে পারে না। কেবল প্রেম, কেবল ভালোবাসাই পারে একজন মানুষকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে আলোর পথে টেনে আনতে। প্রতিটি যুবক-যুবতীর প্রেম করা উচিত, প্রেমে পড়া উচিত। হৃদয়ের শুদ্ধতার জন্য, মনকে আলোকিত করার জন্য প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম অপরিহার্য, প্রেম অনিবার্য। প্রেমের যাদুস্পর্শেই মানুষের হৃদয়ে মহত্ব, মহানুভবতার উন্মেষ ঘটে। মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটি, মনুষত্বটি জেগে ওঠে। এতোদিন ওর মনে হতো প্রেম করা খুবই লজ্জার একটি বিষয়, খুবই গর্হিত গোপন একটি কাজ। সমাজ, সংসার জানতে পারলে কলঙ্ক হবে, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। এ যে কতো বড় মূর্খতা আজ যেন এক মুহূর্তেই অমিত তা বুঝে ফেলেছে। ওর এখন ইচ্ছে করছে টিএসসিতে গিয়ে অনেক উঁচুতে একটা মাইক লাগিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করতে, হে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণী-তরুণ, যুবতী-যুবক, তোমরা সবাই প্রেম করো, মন-প্রাণ উজাড় করে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসো। ভালোবাসার মঙ্গলময় আলোয় স্নাত হোক সকলের হৃদয়। মন থেকে বিতাড়িত হোক সকল অকল্যাণের অন্ধকার।

তাহলে কি এরই নাম প্রেম, ওর মধ্যে যে ওলট পালট শুরু হয়েছে? কেন যে মেয়েদের প্রতি ওর এতো ঘৃণা জন্মেছিলো। মুনাওতো সেদিন একটি শিশু বৈ আর কিছু ছিলো না। সেই এগারো বছরের দস্যি মেয়েটি কি অতোকিছু বুঝে ওকাজ করেছিলো? মজা করতে চেয়েছিলো, মজা পেতে চেয়েছিলো, বন্ধুদের মজা দিতে চেয়েছিলো। আজ এতোগুলো বছর পর টের পায় অমিত, মুনার প্রতি ওর আর কোনো ঘৃণা নেই, ক্ষোভ নেই। মুনার মুখ কল্পণা করে আজ আর ও কোনো ডাইনীর ছবি দেখতে পায় না। একটা ডানপিটে কিশোরীর দুরন্তপনাই কেবল ভেসে উঠছে ওর মানসপটে। বুঝি ভালোবাসার মঙ্গলময় স্পর্শে এমনি করেই মানুষ মহৎ হয়ে ওঠে, উদার হয়ে ওঠে। আজ নিজেকে ওর আকাশের মতো উদার আর সমুদ্রের মতো বিশাল মনে হচ্ছে। মনে মনে ও রফিকউদ্দিনকেও ক্ষমা করে দেয়।

আবারও একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে ওর মস্তিস্কের জানালায় উঁকি দেয়। অপু কি আমাকে ভালোবাসে? না-ইবা বাসলো, না হয় হলোই ওয়ান সাইডেড লাভ। আজ আমার হৃদয় মনে যে পরিবর্তনের দখিনা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, যে ইতিবাচক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে আমার জীবনে এটাই কি এক বিরাট প্রাপ্তি নয়? এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোনো স্বর্গীয় প্রেমের স্পর্শেই ঘটেছে। সেই প্রেম মিথ্যা হতে পারে না, ধোকা হতে পারে না। ওর এখন কেবলি অপুর স্পর্শ পেতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে ওর স্বর্গীয় দ্যুতিময় চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে। ওর স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সারাটা দিন পার করে দিতে।

সিদ্ধান্ত নেয় অমিত, ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত। কথাটা ভেবেই আবার দ্বিধায় পড়ে, শঙ্কায় কেঁপে ওঠে। কি কথা বলবো, কি কথা দিয়ে শুরু করবো? ওকে কি বলবো, অপু আমি তোমাকে ভালোবাসি, আই লাভ ইউ। নাহ, একেবারে বাংলা সিনেমার ডায়লগ হয়ে গেলো। দু'একটা হিন্দি সিনেমা-টিনেমা দেখলেও না হয় এর চেয়ে উন্নত কোন সংলাপ শেখা যেতো। হিন্দি সিনেমার পোকা ভাবীর পাশে বসেতো একটা সিনেমাও কোনোদিন দেখলাম না। 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক' ছবিটা দেখার জন্য ভাবী কতো করে বললেন, কিছুতেই রাজী হলাম না। ভাবী নিশ্চয়ই জানেন, আমি মেয়েদের অপছন্দ করি। তাই আমাকে প্রেমের ছবি দেখাতে চান। অথচ আমার পছন্দ মারদাঙ্গা ছবি। প্রিয় নায়ক সিলভাস্টার স্টালন। আজকাল নাকি আরেকটা প্রেমের ছবি খুব হিট করেছে, 'সাজান'। আজ বাসায় ফিরেই ছবিটা দেখবো, মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় অমিত।

হঠাৎ ওর রিজভীর কথা মনে পড়ে। রিজভী ওর ছোটবেলার বন্ধু। ওর নাম ছিল জামান, সামসুজ্জামান। শাহানা নামের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে ও ক্লাশ টেনে পড়ার সময়। শাহানা ওকে রিজভী বলে ডাকতো। সেই থেকে ও রিজভী হয়ে গেল। এখনতো সারা দেশের মানুষ ওকে এই নামেই চেনে, রিজভী আহমেদ, বিখ্যাত লিরিসিস্ট। কুমার শানু থেকে শুরু করে কে-না ওর লেখা গান গেয়েছে। কৈশোরের ঘোর কাটতে না কাটতেই শাহানার সাথে ওর প্রেমের ঘুড্ডি বাকাট্টা। এবার ওর জীবনে এলো সীমা। বড় ভাই সেলিমের শ্যালিকা সীমার সাথে যখন ও চুটিয়ে প্রেম করছিলো তখন ওরা তিন বন্ধু, রিজভী, টিটু আর অমিত গাঁজা খেতে যেতো মহাখালি। ওদের আরেক বন্ধু কণ্ঠশিল্পী বাদশাহ বুলবুল তখন ওর বাবা-মা, ভাই, ভ্রাতৃবধু, দুই বোন এবং একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে মহাখালীর ঘিঞ্চি গলি ঘুপচির ভেতরে একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে ভাড়া থাকতো। মহাখালির আড্ডাটা গড়ে উঠেছিলো বুলবুলকে ঘিরেই। রিজভী কখনো গাঁজা খেতো না, কিন্তু আসরে থাকতো সবার আগে। ওর মধ্যে গাঁজার কল্কি কখনো নেশা ধরাতে পারে নি। ওর নেশা অন্য কিছুতে, প্রেমে, মেয়েদের সংস্পর্শে। বুলবুল তখনো পুরোপুরি শিল্পী হয়ে ওঠে নি, কিন্তু গান আর গাঁজা ছাড়া ও আর কিছু বুঝতো না। টিটু, অমিত আর বুলবুল যখন গাঁজার কল্কিতে দম দিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে যেতো রিজভী তখন বুলবুলের বোন ডলির সাথে মন নেওয়া-দেওয়া করতো। এলাকায় চাউর হয়ে গেলো, টিটু ও বাড়িতে যায় ডলির জন্য। অমিত মেয়েদের ঘৃণা করে একথা জানা সত্বেও দু'চার কথা ওকেও শুনতে হতো। শুধু কথা শুনতে হতো না রিজভীকে। এসব বিষয়ে ওকে কেউ কখনো সন্দেহ করে না। কারণ ও খুবই ভদ্র ছেলে, গাঁজায় নেই, মারামারিতে নেই, মেয়ে দেখলে সিটি বাজায় না, লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে। একদিন খবর এলো রিজভী ডলিকে নিয়ে ভেগেছে। ডলি সায়ন্তনী তখন কেবল ফুটতে শুরু করেছে। মিল্টন খন্দকারের লেখা ও সুর করা 'হে যুবক' এলবামটি মাত্র বাজারে এসেছে। সবার মুখে মুখে তখন 'রঙচটা জিনসের প্যান্ট পরা, জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ধরা' 'হ্যালো ম্যাগগাইভার' এইসব গান।

এখন ওর রিজভীকেই দরকার। প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে ওর চেয়ে ভালো কনসালটেন্ট আর কে হতে পারে? শালা রিজভীটা কি করে যে এতো সুন্দর সুন্দর পুতুলের মতো মেয়েগুলোকে সুড়সুড় করে ঘর থেকে বের করে আনে, সেই রহস্য জানা খুবই জরুরী। অথচ ও দেখতে এমন আহামরি কিছু না। সাড়ে পাঁচফুটের কম উচ্চতা, গায়ের রঙটাও ময়লা। চেহারায় একটা টক-মিষ্টি ভাব আছে, ওই যা। তবে একটা জিনিসের তারিফ করতে হয়, কথা বলে চমৎকার, একেবারে কবিতার ভাষায়। ইউরেকা। পেয়ে গেছে অমিত। কথা বলাটা প্রাকটিস করতে হবে। নিশ্চয়ই যেসব ছেলেরা গুছিয়ে কতা বলতে পারে মেয়েরা ওদেরকেই বেশী পছন্দ করে।

রিজভীকে একটা ফোন করি। সিক্স জিরো ফাইভ সিক্স ওয়ান নাইন বাটনগুলো পুশ করতেই ওপাশ থেকে মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এলো।

হ্যালো।

আমি অমিত বলছি। রিজভী আছেতো?

ও অমিত ভাই, কেমন আছেন?

ভালো, তোমরা?

এই আছি একরকম। আপনার বন্ধুতো....

কি বাইরে গেছে, দোকানে?

না মানে একটু, আপনি কি একটু পরে করবেন?

কেনো? কি হয়েছে?

ও-তো এখন ইয়ে, মানে বাথরুমে।

'বাথরুমে' শব্দটা ডলি এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন সঙ্গে সঙ্গে ওর নাকে এসে হাগুর গন্ধ লাগলো।

ঠিক আছে ঠিক আছে....ছেড়ে দিচ্ছি। আমি একটু পরে আবার করবো।

হাত ঘড়িটায় চোখ রাখে ও। পৌনে এগারোটা। শালা এতোক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে। শিল্প-সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এই এক মহাসমস্যা। সারা রাত হাতি-ঘোড়া মেরে দুপুর অব্দি নাক ডেকে ঘুমানো।

* * * * * *

হালকা ভলিউমে ক্যাসেট প্লেয়ার বাজছে। পূরবী রায় গাইছেন,

বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছো দান
আমি দিতে এসেছি শ্রাবনের গান
মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে
এই যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান
আজ এনে দিলে হয়ত দিবে না কাল
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল
এ গান আমার শ্রাবনে শ্রাবনে তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সন্মান।।

এতোদিন অপু শুধু একটি গান শুনেছিলো। আজ শুনছে হৃদয়ের শব্দ আর তাতে সংযোজিত অনিবার্য সুরের ঝংকার। এ আর আজ কোনো গান নয়, প্রাণ বেজে উঠছে, ওর হৃদয় বেজে উঠছে, ওর জীবন বেজে উঠছে। হৃদয় উৎসারিত সুরের মূর্ছনা শতধারায় ছড়িয়ে পড়ছে আজ আকাশে বাতাশে। গানের প্রতিটি শব্দ ওর মন থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে মস্তিস্কে, মস্তিস্কের গোপন গহীনে লুকানো একটি সেলে নাম না জানা এক ওমে, উত্তাপে সৃষ্টি করছে নতুন এক তরঙ্গ, জীবনের নতুন উন্মেষ। সেখানে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছে এক নতুন শিহরণ, জীবনের এক নতুন অনুভূতি, ভালোবাসা। বর্ষার অবিরল ধারায় এ ধরাতল যখন শুদ্ধ হচ্ছে, নির্মল হচ্ছে, তখন ভালোবাসার বর্ষাজলের অমিয় ধারায় ওর হৃদয়ের ওপর থেকে ভেসে যাচ্ছে উগ্র আধুনিকতার ঝরাপাতা, সকল সংস্কারের পচা আবর্জনা। ভালোবাসার উজ্জ্বল আলোয় ক্রমশ উদ্ভাসিত হচ্ছে ওর হৃদয়-মন। এক স্বর্গীয় দ্যুতি ওর মন থেকে দূর করে দিচ্ছে সমস্ত শঙ্কা।

সন্নাসীর মতো পা দুটো ভাঁজ করে খাটের ঠিক মাঝখানটায় একটা হালকা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে দুই চোখ বন্ধ করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছে অপু। ও যেন আর এখানে, এই চারদেয়ালের ভেতরে নেই। কোন সুদূরে ভেসে গেছে তা ও নিজেও জানে না। জানালার ওপাশে কাঁচের ওপর ঝড়ের দাপটে রক্তকরবীর ডাল এসে আছড়ে পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টির ছাট এসে জানালার কাচে ঝাপটা মারছে, এতে যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে তাতে ওর মগ্নতায় একটুও আঘাত হচ্ছে না বরং এই বরষার ছন্দ ওর প্রার্থনার বেদীতে অর্ঘ ঢেলে দিচ্ছে।

খটাস করে একটা শব্দ হয়ে ক্যাসেট প্লেয়ারটি বন্ধ হয়ে গেলো।

ঘোরের তার ছিঁড়ে যায় অপুর। ওর বড় বড় চোখ দুটি থেকে খানিকটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় দরোজার কাছাকাছি রাখা ওয়াডরোবের ওপর, যেখানে শব্দহীন অবস্থায় পড়ে হাসফাস করেছে একটি শব্দযন্ত্র, অপুর এই মুহূর্তেরে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ক্যাসেট প্লেয়ারটি।

কি-রে অপু, এখনো ঘুমাস নি? এতো রাতে কেউ বসে বসে গান শোনে? নে শুয়ে পড়, গান শুনতে হয় শুয়ে শুয়ে শোন।

দেয়াল ঘড়িতে চোখ রাখে দু'বোন একসাথে, বারোটা পেরিয়ে গেছে। মৃদু ধমক দিয়ে কথা বলে মিলি। এ অধিকার ওর আছে। মিলি শুধু ওর বড় বোনই না, একাধারে মা-ও। মিলিই ওর সব। মনিরের হাত ধরে যেদিন মিলি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়, সেদিন ওর চেয়ে আর কে বেশী কস্ট পেয়েছিলো? খন্দকার সাহেবতো বলেছিলেন 'জাহান্নামে গেছে, ভুলে যাও সব'। কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়। আর তিনিওকি আঁড়ালে মেয়ের জন্য চোখের জল ফেলেন নি। সেই জল আর সকলের কাছ থেকে আঁড়াল করতে পারলেও অপু তা ঠিক দেখেছিলো। আর তখনি দুজনের কান্নার দুটি গোপন প্রবাহ এক মোহনায় মিলিত হয়ে একই সাগরে দিকে ছুটে গিয়েছিলো।

মিলিই ওর সব। মিলিরও প্রাণ অপু। বিয়ের পর তিনটি মাস ওকে ছেড়ে যে কিভাবে ছিলো তা ও-ই জানে, আর জানে একজন; অপুহীন পৃথিবীতে মিলির চোখের জলে যার বুক ভিজেছে, সুখ ভিজেছে। অপুর যখন তিন বছর, মিলি তখন কলেজে উঠেছে। হঠাৎ একদিন সকালে ওদের মা আর ঘুম থেকে ওঠেন নি, এরপর তিনি আর কোনোদিনই ওঠেন নি। ডাক্তার জানালেন ম্যাসিভ হার্ট এটাক। মাঝখানে আর কোন ভাই-বোন নেই ওদের। মিলি শুধু মায়ের দায়িত্ব নিয়েই ওকে বড় করে তোলে নি, হয়ে উঠেছে ওর বন্ধুও, জিগিরি দোস্ত। অসম বয়সের এই দুবোন যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্ধুযুগল, সকল বন্ধুর ঈর্ষাতীর্থ। বয়সের এই পার্থক্য কিংবা সহোদরা হওয়া, এর কোনোটাই ওদের খোলামেলা, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের অন্তরায় হতে পারে নি। দুবোনই মনের দিক থেকে একদম সোজা-সাপটা, শাদা দিলের মানুষ। তবে চাল-চলনে রয়েছে আসমান-জমিন ফারাক, দুজনের অবস্থান দুই মেরুতে। মিলি যেমন টিপিক্যাল বাঙালী রমনী, অপু ঠিক তার উল্টো। মিলির প্রিয় পোশাক শাড়ি, অপুর প্যান্ট-শার্ট। অবশ্য অপুকে এভাবে মিলিই গড়ে তুলেছে। ওদের কোনো ভাই নেই বলে, ভাইয়ের অভাব ভুলতে অপুকে মিলি ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের পোশাক পরাতো। অপু নামটাও মিলিরই দেয়া। শুধু তাই না, মিলি ওকে বেশীরভাগ সময়ই ভাই বলে ডাকে।

ওটা অন করে দাও

সেনাপ্রধানের মতো নির্দেশের সুর অপুর কণ্ঠে। কথাটা বলেই কটমট করে তাকায় ও মিলির দিকে। ডান হাতের তর্জনীটা তখনো ক্যাসেট প্লেয়ারটির দিকে ধরা আছে।

এখন কটা বাজে?

অপুর ঠিক বিপরীত সুরে খুব নরোম গলায় প্রশ্ন করে মিলি।

যতোটাই বাজুক। তোমাকে বলেছি প্লেয়ারটি অন করো, নইলে কিন্তু খবর আছে আপু।

অপু।

চাপা অথচ বেশ তিব্র একটা ধমক দেয় মিলি।

বাবা অসুস্থ।

পরক্ষণেই আবার গলাটা নরোম করে ও।

আপু, শব্দটা বাবার ঘরে যায় না।

বেশ আব্দারের সুর অপুর কণ্ঠে, আর তখনি ওর কণ্ঠে নাকি সুরের একটা আহ্লাদি ভাব আসে।

না যাক। এখন সাড়ে বারোটা বাজে। কাল তোর ক্লাস নেই?

আছে। বিকেলে।

রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে ভাই। যা শুয়ে পড়।

কথাটা বলেই খাটের ওপর উঠে আসে মিলি। সস্নেহে হাত রাখে অপুর কপালে।

এই তো, গা গরম হয়ে উঠেছে। শিগগির শুয়ে পড়তো, লক্ষী ভাই আমার, মশারী খাটিয়ে দেবো?

না আমি নিজেই খাটিয়ে নেবো। আপু তুমি এখন যাও না প্লিজ। আমারওতো একটা স্বাধীনতা আছে না-কি? প্রাইভেসি-ট্রাইভেসি বলে কিছু মানো তো?

ও ব্বাবাহ.........

অপুকে ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো পেছনে এনে হাঁটু গেঁড়ে বিছানার ওপর অর্ধদন্ডায়মান মিলি সেনা সদস্যদের মতো আরামে দাঁড়ায়।

ভাইটি আমার বেশ বড় হয়ে গেছেতো!

তো, সারা জীবন কি ছোটই থাকবো?

তা এই বড় হওয়াটা কবে থেকে শুনি?

মিলি এখন তাকিয়ে আছে অপুর চোখের দিকে। চোখ নামায় অপু। আস্তে করে, খুব মৃদুস্বরে বলে,

আজ সকাল থেকে।

ততোক্ষণে খাট থেকে নেমে গেছে মিলি। ও এখন ওয়াডরোবের ভেতর থেকে মশারী বের করে মশারীর ভাঁজ খুলছে। অপুও বিছানা থেকে নেমে আসে। ঝড়ের দাপট আরো বেড়েছে। বিদ্যুচ্চমকের আলোয়

এক ঝলকের জন্য বাইরের অন্ধকার পৃথিবীটা আলোকিত হয়। সেই আলোয় অপু দেখতে পায় আমগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙ্গে জানালার ওপর পড়ে আছে, জানালার অর্ধেকটা কাচ তাতে ঢাকা পড়েছে। সাথে সাথে কাছে কোথাও বাজ পড়ে। প্রচন্ড শব্দে কেঁপে ওঠে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র, জানালার কাচ।

এ সময় অপু লিলির গলা জড়িয়ে ধরে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। ভয়ে না আনন্দে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চিৎকার করতে করতে একসময় নাচতে শুরু করে ও। এই মধ্যরাতে যে এভাবে নাচনাচি করা, চেচামিচি করাটা অনুচিত তা ওর ধর্তব্যের মধ্যেই যেন নেই। ওর হৃদয়ে এখন অন্য বরষা, বজ্রপাতে সব লন্ডভন্ড। পৃথিবীর অন্য সকল বিষয়গুলো এখন খুবই তুচ্ছ ওর কাছে।

এই থাম, থাম বলছি। কি-রে, কি হয়েছে, হয়েছেটা কি তোর? পাগল হলি নাকি?

অপুর উচ্ছাসকে থামাতে পারে না মিলি। এই উচ্ছাসকে কি থামানো যায়, না থামাতে পেরেছে কেউ কোনোকালে। শাসন-বারণহীন মুক্ত বিহঙ্গের মতো এই ঝড়ের রাতে ওর আকাশে ডানা মেলে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে, গন্তব্যহীন কোনো অজানায়।

আসল ঘটনাটা কি বল দেখি, এই অপু।

বাঁ হাতটা আলতো করে অপুর গালে ছোঁয়ায় মিলি। তারপর ঠিক ওর উল্টোদিকে ঘুরে প্রশ্ন করে,

কারো প্রেমে-ট্রেমে পড়িস নি তো?

প্রশ্নটা কি ও অপুকে করলো, না নিজেকে করলো; না কি কাউকেই করে নি, এমনি এমনি বললো, একটা কথার কথা? এর যে কোনোটাই হতে পারে। তবে কথাটা বলেই নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মিলি। কিছু একটা রেসপন্স প্রত্যাশা করছে অপুর কাছ থেকে। ওপাশ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ আসছে না দেখে আস্তে আস্তে হেঁটে অপুকে পাশ কাটিয়ে, যেন ওকে দেখতেই পায় নি, এরকমভাবে জানালার কাছে এগিয়ে যায় মিলি। তখন আবারো একটা বিদ্যুৎ চমকায় আকাশে। মিলি দেখে আমগাছের ভাঙা ডালটা কাত হয়ে পড়ে আছে বাগানের ওপর। ওর প্রিয় রঙ্গন আর নয়নতারার চারাগুলো বুঝি গেলো।

মাথা নিচু করে দুচোখ মুদে লজ্জায় দুহাতের করতলে মুখ লুকিয়ে রেখেছে অপু। মিলির কাছে কিসের এতো লজ্জা ওর। মিলিতো শুধু ওর বড় বোনই না, বেষ্ট ফ্রেন্ডও। মনিরের সাথে প্রেম পর্বের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তও নেই যা মিলি ওর সাথে শেয়ার করে নি। ওরই বয়েসী রিণা, ওইতো দুটো বাড়ি পরেই যে তালগাছটা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ওই তালগাছঅলা বাড়ির নুরু হাজীর

মেয়ে রিণা, ওদেরই গৃহশিক্ষক মিজানুর রহমানের সাথে পালিয়ে গেলো। এ নিয়ে সেদিন ছাদে দাঁড়িয়ে তালগাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে কতো গল্প করেছে দুবোন, পুরো একটা বিকেল পার করে দিয়েছে। এর পূর্বাপর কার্যকারণ নিয়েও কথা বলেছে ওরা, বলেছে সম্ভাব্য পরিণতির কথাও। অথচ আজ এই 'প্রেম' শব্দটিতে ও এমন গুটিয়ে যাচ্ছে কেনো? কিসের এতো লজ্জা? অপুর বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটা ধরাস ধরাস করছে। ভয়ে না লজ্জায়, বুঝতে পারে না অপু। ও কি ইতোমধ্যেই এর পরিণতি ভাবতে শুরু করেছে। মনিরের সাথে মিলির বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতে এ সংসারে যে অশান্তির অন্ধকার নেমে এসেছিলো, ও কি একই রকম সমূহ অশুভ মেঘের অশঙ্কায় কেঁপে উঠছে? অপু এটুকু বেশ বুঝতে পারে ওর ভেতরে ঠিক ওইরকমই একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে। তবে প্রচন্ড ওলট-পালটে ভাঙনই যে শুধু শুরু হয়েছে তা-ই না। এই খরস্রোতা নদীর অন্য পাড়ে কোথাও জেগে উঠছে নতুন চর। সেই চরে সবুজ ঘাসের ডগা লকলক করে দুলছে বর্ষার ভেজা বাতাশে।